দেশবরেণ্য সাংবাদিক

এবিএম মূসা

সম্মাননা প্রকাশনা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা
অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন

সম্মাননা প্রকাশনা ২০১৩

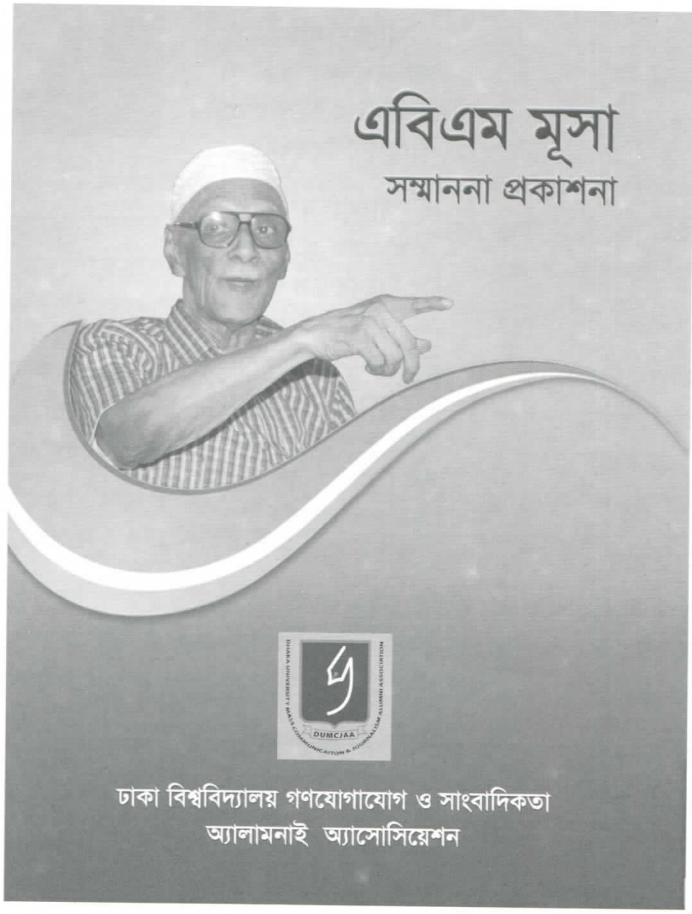

DUMCJAA
DHAKA UNIVERSITY MASS COMMUNICAITON & JOURNALISM ALUMNI ASSOCIATION

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন
DU MASS COMMUNICATION & JOURNALISM ALUMNI ASSOCATION (DUMCJAA)

সম্মাননা প্রকাশনা ২০১৩

দেশবরেণ্য সাংবাদিক
এবিএম মূসা

অনুষ্ঠানসূচি

অভিনন্দনপত্র পাঠ

সম্মাননা ক্রেস্ট ও উত্তরীয় প্রদান

প্রকাশনা উদ্বোধন

আলোচনা

ড. সাখাওয়াত আলী খান

জনাব মাহবুব উল আলম

জনাব আবেদ খান

জনাব মাহবুব জামিল

জনাব রিয়াজ উদ্দিন আহমেদ

অধ্যাপক আখতার সুলতানা

অধ্যাপক শেখ আবদুস সালাম

জনাব মঞ্জুরুল আহসান বুলবুল

আরও অনেকে

প্রকাশকাল

৫ অক্টোবর ২০১৩

উপদেষ্টা সম্পাদক

ড. গোলাম রহমান, এম খায়রুল কবীর, স্বপন কুমার দাস

সম্পাদক

অলিউর রহমান

সহযোগী সম্পাদক

মো: শামসুল হক, এ এস এম বজলুল হক, মীর মাসরুর জামান, মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন, আহমেদ পিপুল

প্রকাশনা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন

কলা ভবন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা ১০০০

ই-মেইল: dumcjaa12@gmail.com ওয়েব: www.dumcjaa.org

মুদ্রণ

মমিন অফসেট প্রেস

ইমেইল: mominop@gmail.com

অভিনন্দন

বাংলাদেশের সাংবাদিকতার ইতিহাস পর্যবেক্ষণে দেখা যায় কয়েকজন সাংবাদিক তাঁদের জীবন উৎসর্গীকৃত করেছেন পেশার আদর্শে। এ বি এম মূসা এমন একজন নিবেদিতপ্রাণ সাংবাদিক। প্রায় ৬০ বছর ধরে লিখে চলেছেন অক্লান্ত পথিকের মত। সাম্প্রতিককালে সমধিক পরিচিতি লাভ করেছেন বিভিন্ন টিভি চ্যানেলের টকশো'তে অংশগ্রহণ করে এবং কলাম লিখে।

মূসা ভাই দেশের সংবাদপত্র এবং নিউজ এজেন্সিতে রিপোর্ট করেছেন; সম্পাদকের গুরুভার পালন করেছেন এবং বিদেশি সংবাদপত্র ও সংবাদসংস্থার জন্যও দায়িত্ব পালন করেছেন। বিবিসি, সানডে টাইমস, ইকোনোমিস্ট এবং এশিয়ান নিউজ সার্ভিসের ঢাকা, কোলকাতা ও ব্যাংককের বিশেষ দায়িত্ব পালন করেছেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি অনেক গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ সরবরাহ করেছেন দেশি এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংবাদ সংস্থায়।

এ বি এম মূসা সাংবাদিকতার প্রতিষ্ঠানগুলোকে একই যোগ্যতায় গড়ে তুলেছেন। এগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট-এর মহাপরিচালক, বাংলাদেশ টেলিভিশনের মহাব্যবস্থাপক এবং বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থার ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে বিভিন্ন সময়ে দায়িত্ব পালন করেছেন।

পত্র-পত্রিকায় এ বি এম মূসার কলাম পাঠকের দৃষ্টি কাড়ে বিশেষ কারণে। তাঁর সোজা-সাপ্টা কথা, যৌক্তিক বিশ্লেষণ, সাহসী উপস্থাপন এবং বিভিন্ন বক্তব্যের সার্বিকতা বিশেষভাবে উল্লেখ করার মত।

আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন-এর পক্ষ থেকে এই কৃতী দেশবরেণ্য সাংবাদিককে সম্মাননা জানাতে পেরে নিজেদেরকে গর্বিত মনে করছি।

এবিএম মূসা শতায়ু হোন। বাংলাদেশের সাংবাদিকতায় তাঁর অবদান অক্ষুণ্ণ থাকুক–এই কামনা করি। মূসা ভাই, আমাদের অভিনন্দন গ্রহণ করুন।

ড. মোঃ গোলাম রহমান
অধ্যাপক, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ, ঢা.বি. ও
সভাপতি
ঢা.বি. গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন

পথিকৃৎ সাংবাদিক এবিএম মূসা

অলিউর রহমান

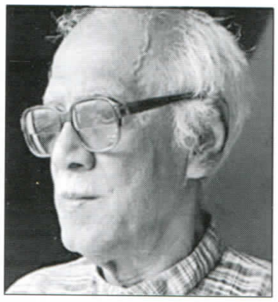

কোনো সমস্যা নিয়ে রিপোর্ট করলে শুধু সমস্যাটি ও তার কারণ লিখলেই হবে না
সেটি সমাধান করা যায় কীভাবে, তা-ও খুঁজে বের করে বলতে হবে।
– এবিএম মূসা

'চিন্তার স্বকীয়তা আর স্বাধীন চিন্তা প্রকাশের সমার্থক যদি কোনো মানুষের নাম হয়, তা হলে সেই নাম এবিএম মূসা'। সাংবাদিকতার বহুমাত্রিক অঙ্গনে ছয় দশকের বেশি সময় ধরে অনবদ্য অবদান রেখে বাংলাদেশের গণমাধ্যম জগতে তিনি আজ জীবন্ত এক কিংবদন্তি। পঞ্চাশ দশকের শুরু থেকে অদ্যাবধি দেশের সংবাদ মাধ্যমের মূলস্রোতের সঙ্গে তাঁর সম্পৃক্ততা অবিচ্ছেদ্য ও অবিস্মরণীয়। সফল সংগঠক এবিএম মূসা সাংবাদিকতার পাশাপাশি দেশের রাজনীতিতেও সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে জাতীয় জীবনে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের স্বাক্ষর রেখেছেন।

এবিএম মূসা। পূর্ণ নাম আবুল বাশার মোহাম্মদ মূসা। পিতার নাম আশ্রাফ আলী। মাতা সাজেদা খাতুন। এবিএম মূসার আদি বংশধর এসেছিলো চৌদ্দগ্রাম থেকে। বংশের নাম মিয়াজি। পূর্বপুরুষ কুতুবউদ্দিন মিয়াজির নামানুসারে গ্রামের নাম হয় কুতুবপুর। মনু মিয়ার বিয়ের সেই পুরান গান, *'মালকাবানুর দেশেরে, বিয়ার বাদ্যবালা বাজেরে, মালকাবানুর সাত ভাই, মনু মিয়ার কেউ নাই'* – কে না শুনেছে মালকাবানুকে নিয়ে রচিত এই গান; গানের সেই মালকাবানুই হলো এবিএম মূসা'র নানা দুলুমিয়া মুন্সির ফুফু।

এবিএম মূসার জন্ম ১৯৩১ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি। ফেনী জেলার পরশুরাম থানার ধর্মপুর গ্রামে। এটা ছিল তাঁর নানাবাড়ী। ছেলেবেলার উল্লেখযোগ্য সময় কেটেছে তাঁর এই নানা বাড়িতেই। খুব কম বয়সে তাঁর মা-বাবার বিয়ে হয়। জন্মকালে তাঁর মায়ের বয়স ছিল পনের বছর। ভাই-বোনদের মধ্যে এবিএম মূসা পিতা-মাতার দ্বিতীয় সন্তান।

শৈশবের পুরো অংশ নোয়াখালীতে কাটাতে পারেননি এবিএম মূসা। পিতা আশরাফ আলী ছিলেন সেসময়কার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। আট বছর বয়সে বাবার কর্মক্ষেত্র বদলির সুবাদে তিনি চলে গেলেন চট্রগ্রামে। বাবার সাথে হাটহাজারীতে থেকে পড়াশুনা করেন সপ্তম শ্রেণীতে। সার্কেল অফিসার হয়ে বাবা বদলী হলে অষ্টম শ্রেণীতে ভর্তি হন চিটাগাং মুসলিম হাইস্কুলে। এখানে নবম শ্রেণী পর্যন্ত পড়ার সময় অনেকের সঙ্গে সহপাঠী ও বন্ধু হিসেবে পেয়েছেন সুলতান আহমেদ চৌধুরীকে যিনি পরে স্পিকার হয়েছিলেন। স্কুল পালিয়ে বন্ধুদের নিয়ে পাহাড়ের খাত বেয়ে নিচে নেমে এসে চুপটি করে সিনেমা হলে ঢুকে পড়া এবং সেময়কার জনপ্রিয় সব সিনেমা দেখার নানা মধুর স্মৃতি তাঁর জড়িয়ে আছে এই চট্রগ্রামে।

বাবা বরিশালের গলাচিপায় বদলি হয়ে গেলে ১৯৪৫ সালে তিনি ফিরে আসেন নিজ গ্রাম কুতুবপুরে। ভর্তি হলেন নোয়াখালী জেলা স্কুলে। ১৯৪৬ সালে এই স্কুল থেকেই ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করে ভর্তি হলেন ফেনী কলেজে। ফেনী কলেজে অল্প ক'দিন পড়ে তাঁর ভালো লাগলোনা কলেজটিকে। চলে গেলেন কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজে। আর এই কলেজ থেকেই ১৯৪৮ সালে আইএ পরীক্ষা দিয়ে উত্তীর্ণ হন।

ভাষা আন্দোলনের শুরু। ১৯৪৮ সালের ১১ই মার্চ প্রথম গ্রেফতার হন এবিএম মূসা। তাঁর সাথে ছিলেন বদরুল হায়দার যিনি পরে ক্রীড়া সাংবাদিক ও ক্রীড়া ভাষ্যকার হয়েছিলেন। জেল থেকে মুক্তি পাবার

পর যখন থার্ড ইয়ারে ভর্তি হতে গেলেন কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজে । কলেজ কর্তৃপক্ষ ভর্তি নিলো না। কারণ, পাকিস্তান আমল – আবার বাংলা ভাষা নিয়ে আন্দোলন। বাধ্য হয়ে তিনি চলে গেলেন চৌমুহনীতে। চৌমুহনী কলেজের প্রিন্সিপাল টি হোসেন (তোফাজ্জল হোসেন) স্যার (সাবেক আইজিপি শাহাজাহান সাহেবের শ্বশুর) তাঁকে ভর্তি করে নিলেন। এখান থেকেই তিনি বিএ পরীক্ষায় অবতীর্ণ হন এবং পাশ করে চলে এলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। এসময় থাকতেন তিনি ইকবাল হলে (বর্তমান সূর্যসেন হল)। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে থেকে ভাষা আন্দোলন করতে গিয়ে ভাষা সৈনিক গাজিউল হকসহ অনেকের সঙ্গে রয়েছে তাঁর বিচিত্র অভিজ্ঞতার স্মৃতি।

ছাত্রাবস্থাতেই এবিএম মূসা একটি পত্রিকা সম্পাদনার দায়িত্ব পেয়েছিলেন। 'কৈফিয়ৎ' নামের সেই পত্রিকার প্রকাশক ছিলেন এহতেশাম হায়দার চৌধুরী; আর এবিএম মূসা ছিলেন সম্পাদক। লেখাপড়ার ইস্তফা দিয়ে সাংবাদিকতার পূর্ণকালীন পেশাগত জীবনে প্রবেশ করেন তিনি ১৯৫০ সালে। দৈনিক ইনসাফে সহ-সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণের মধ্য দিয়ে শুরু হয় তাঁর পেশাগত সাংবাদিক জীবন। পত্রিকাটির বার্তা সম্পাদক ছিলেন কে জি মুস্তাফা। মাসিক বেতন পঁচাত্তর টাকা। কিছুদিন পর মালিকের সঙ্গে কোনো ব্যাপারে মতান্তরের কারণে বার্তা সম্পাদক কে জি মুস্তাফা পদত্যাগ করলে এবিএম মূসাও তাঁর সঙ্গে সংহতি জানিয়ে ইনসাফ ছাড়লেন। ইনসাফে তিন মাসের কাজের অভিজ্ঞতা নিয়ে এবিএম মূসা যোগ দেন ইংরেজি দৈনিক পাকিস্তান অবজারভারে।

ইতোমধ্যে তিনি সূর্যসেন হল ছেড়ে ছোট্ট একটি ঘর নিলেন গোপীবাগে। এ সময়ে তাঁর উদ্যোগে গড়ে উঠল ব্রাদার্স ইউনিয়ন। এবিএম মূসা ছিলেন প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক আর আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নেতা মহীউদ্দিন হলেন সভাপতি।

১৯৫০ সালের নভেম্বরে এবিএম মূসা যোগ দেন পাকিস্তান অবজারভারে শিক্ষানবীশ সহ-সম্পাদক হিসেবে। পাকিস্তান অবজার্ভারের সম্পাদক তখন আবদুস সালাম। 'সহ-সম্পাদক' পদে কাজ শুরু করে পর্যায়ক্রমে এবিএম মূসা পত্রিকাটির বিভিন্ন গুরুতপূর্ণ পদের দায়িত্বলাভ করেন।

১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলনের সত্যনিষ্ঠ প্রতিবেদন ছাপার কারণে পাকিস্তান অবজারভার বন্ধ হয়ে গেলে এবিএম মূসা যোগ দেন দৈনিক সংবাদে। দু'বছর প্রায় কাজ করেন সংবাদে। ১৯৫৪ সালে আবার অবজারভার প্রকাশিত হলে তিনি ফিরে আসেন অবজারভারে। অতঃপর তিনি একে একে পত্রিকাটির রিপোর্টার, স্পোর্টস রিপোর্টার, সিনিয়র সহ-সম্পাদক, প্রধান প্রতিবেদক ও বার্তা সম্পাদক পদে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৫৭ সালে পত্রিকাটির বার্তা সম্পাদকের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন তিনি।

১৯৬১ সালে এবিএম মূসা কমনওয়েলথ প্রেস ইনস্টিটিউটের বৃত্তি নিয়ে লন্ডনে যান। অক্সফোর্ডে কুইন এলিজাবেথ হাউসে থেকে তিনি সাংবাদিকতার ওপর ছ'মাসের ডিপ্লোমা কোর্স সম্পন্ন করেন। সেখান থেকে ফিরে এসে তিনি অবজারভারের সনাতনী চেহারা বদলে দেন। প্রশিক্ষণকালে যুক্তরাজ্যের লন্ডন টাইমস পত্রিকায় তাঁর কাজের অভিজ্ঞতা এবং প্রশিক্ষণলব্ধ দক্ষতার ছাপ লক্ষ করা যায় সংবাদপত্র জগতের নতুন মেকআপ ব্যবস্থা প্রচলনের মধ্য দিয়ে পাকিস্তান অবজারভারে। তাঁর সুদক্ষ তদারকি এবং আব্দুল গণি হাজারীর কুশলী সহায়তায় অবজারভার পত্রিকাটি প্রযুক্তিগত উৎকর্ষে এ ক্ষেত্রে সংবাদপত্র জগতের পথিকৃৎ হয়ে উঠে।

এবিএম মূসা কাজ করেছেন দৈনিক সংবাদ, দৈনিক ইনসাফসহ বেশকিছু বাংলা পত্রিকায়। তবে ইংরেজি পত্রিকায় কাজ করার আগ্রহ থেকেই মূলত তাঁর অবজারভারে আসা এবং বলা যায়, এখানেই কেটে যায় তাঁর সাংবাদিকতা জীবনের গৌরবোজ্জ্বল এক অধ্যায়। পাকিস্তান অবজারভারের বিভিন্ন পদ ও দায়িত্বে ১৯৫০ থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত সম্পৃক্ত থাকার সুবাদে তাঁর বর্নাঢ্যময় সাংবাদিকতা জীবনের প্রায় দু'দশক কেটেছে এই পত্রিকায়।

১৯৬৫ সালে তাসখন্দে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের অবসান ঘটিয়ে চুক্তি সম্পাদন করার পর ভারতের প্রধানমন্ত্রী 'লালবাহাদুর শাস্ত্রীর' মৃত্যুর সংবাদ প্রকাশসহ বিভিন্নসময়ের আন্তর্জাতিক ইস্যুতে গুরুত্বপূর্ণ রিপোর্টিংয়ের জন্য তিনি আন্তর্জাতিক সম্মান ও খ্যাতি লাভ করেন।

এবিএম মূসা বাংলাদেশের পত্রিকার পাশাপাশি বিবিসি, লন্ডনের দি টাইমস, দি সানডে টাইমস, ইকোনোমিস্ট প্রভৃতি বিদেশী সংবাদ মাধ্যমে বাংলাদেশ প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করেছেন। লন্ডন টাইমসের প্রখ্যাত সাংবাদিক হ্যারল্ড ইভান্সের সঙ্গে ছিল তাঁর বিশেষ পরিচয় ও যোগাযোগ।

পেশাদার সাংবাদিক এবিএম মূসা একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধে রণাঙ্গন সাংবাদিকের ভূমিকায় অংশগ্রহণ করেন। ১৯৭১ সালে যুদ্ধের সময় বিবিসি, সানডে টাইমস প্রভৃতি পত্রিকার সংবাদদাতা হিসেবে তিনি রণাঙ্গন থেকে সংবাদ প্রেরণ করতেন। রণাঙ্গন সংবাদদাতা হিসেবে উল্লিখিত সংবাদমাধ্যমসহ লন্ডন ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন কাগজে তাঁর প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়।

তিনি ১৯৭১-৭২ সালে হংকং-এর এশিয়ান নিউজ সার্ভিসের ঢাকা, কোলকাতা ও ব্যাংককের বিশেষ প্রতিনিধির দায়িত্ব পালন করেন।

স্বাধীনতার পর তিনি পর্যায়ক্রমে বিটিভির মহাব্যবস্থাপক, মর্নিং নিউজের সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশ টেলিভিশন কর্পোরেশনের প্রথম মহাপরিচালক হিসেবে তিনি ১৯৭২ সালে দায়িত্ব নিয়ে টেলিভিশনকে নতুন করে সংগঠিত করেন। অতঃপর তিনি এক বছরের মতো (১৯৭২-১৯৭৩) ঢাকা থেকে প্রকাশিত দৈনিক মর্নিং নিউজ-এর সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

কয়েক বছর তিনি (১৯৭৭ সাল পর্যন্ত) ফ্রিল্যান্স সাংবাদিক হিসেবে সানডে টাইমস, দি ইকনোমিস্ট লন্ডন এবং রেডিও নিউজিল্যান্ডের সংবাদদাতা হিসেবেও কাজ করেছেন। এরপর তিনি 'দি নিউ নেশন' পত্রিকার (১৯৭৭-৭৮) উপদেষ্টা সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

স্বাধীন বাংলাদেশে ১৯৭৩ সালের প্রথম জাতীয় নির্বাচনে এবিএম মূসা সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন।

১৯৭৮ থেকে ১৯৮০ সাল পর্যন্ত তিনি ব্যাংককে জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচির (এসকাপ) অধীনে এশিয়া প্যাসেফিক অঞ্চলে আঞ্চলিক পরিচালক পদে যোগ দেন।

১৯৮১ সালে বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট (পিআইবি)-এর মহাপরিচালক পদে যোগদান করেন এবিএম মূসা। ১৯৮৫ সাল পর্যন্ত তিনি এ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এরপর তিনি বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থার প্রধান সম্পাদক এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন ১৯৮৭ সাল পর্যন্ত। ২০০৪ সালে তিনি দৈনিক যুগান্তরের সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন।

এ বি এম মূসা জাতীয় প্রেসক্লাবের চারবার সভাপতি এবং তিনবার সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন। তিনি তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান সাংবাদিক ইউনিয়নের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং পূর্ব পাকিস্তান সাংবাদিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। পাকিস্তান ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নেরও তিনি একজন প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ও কার্যকরী সংসদের সদস্য ছিলেন।

জনপ্রিয় কলাম লেখক এবিএম মূসা বর্তমানে দৈনিক পত্রিকায় লেখালেখির পাশাপাশি একজন দর্শক নন্দিত আলোচক এবং সংবাদ বিশ্লেষক হিসেবে বিভিন্ন টিভি চ্যানেলের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে যাচ্ছেন।

বাংলাদেশের সংবাদপত্রের গতানুগতিক ধারার পরিবর্তনে এবিএম মূসার অবদান অনেক। প্রযুক্তির প্রয়োগের সঙ্গে অফসেটের শৈল্পিক ব্যবহারের সূচনাও ঘটে তাঁর হাত ধরে। কমনওয়েলথ প্রেস ইউনিয়নের ফেলোশিপ নিয়ে যুক্তরাজ্য থেকে সাংবাদিকতার ওপর ডিপ্লোমা ডিগ্রি অর্জন করে দেশে ফিরে তিনি প্রশিক্ষণলব্ধ ধ্যান-ধারণা ও অভিজ্ঞতা বাস্তবায়ন করেন ঈর্ষণীয় পেশাদারিত্বের সঙ্গে।

সাংবাদিকতায় প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার ব্যাপারে নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি থাকলেও এর গুরুত্ব উপলব্ধি করে এক পর্যায়ে তিনি তাঁর কণ্যা পারভীন সুলতানাকে ভর্তি করেন গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগে। সাংবাদিকতার জগতে পারভীন সুলতানা ঝুমা এখন তাই এক পরিচিত নাম। এবিএম মূসার হাত ধরে তৈরি হয়েছেন এদেশের বহু প্রথিতযশা সাংবাদিক-কলম সৈনিক।

সাংবাদিকতাকে পেশাগত জীবনে বেছে নিলেও তার চেতনায় রাজনীতি ছিল সদা জাগ্রত। তরুণ বয়সেই রাজনীতি ও সমাজ চেতনা তাঁকে শিহরিত করলেও স্বাধীনতা পরবর্তীকালে তিনি রাজনীতির সঙ্গে সরাসরি সম্পৃক্ত হয়ে তার প্রতিফলন ঘটিয়েছেন। এরই ধারাবাহিকতায় তিনি একজন সংসদ সদস্য হিসেবে ১৯৭৩-৭৫ সালে জাতীয় সংসদে প্রতিনিধিত্ব করেন।

বহুকালদর্শী অভিজ্ঞ সাংবাদিক এবিএম মূসা তাঁর সুদীর্ঘ পেশাগত জীবনের অভিজ্ঞতা এবং রাজনৈতিক পর্যবেক্ষণ থেকে বর্তমানে নিয়মিত কলাম লিখছেন 'জনকণ্ঠ', 'যুগান্তর', 'প্রথম আলো'সহ বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকে। দৈনিক 'যুগান্তর'-এর সম্পাদকের দায়িত্বও পালন করেছেন বেশকিছুকাল। স্বীয় জীবনের কর্মসফল অভিজ্ঞতার আলোকে মেধা ও মনন দিয়ে এখনও তিনি জাতীয় জীবনের নানা সমস্যা ও সম্ভাবনাকে সমানভাবে লালন করে যাচ্ছেন। আর প্রতিনিয়ত তিনি স্বকীয় 'কলম ও কলামে' তা তুলে ধরছেন নিখুঁতভাবে। তাইত তিনি একাধারে হতে পেরেছেন সময়ের সাহসীকণ্ঠ, সার্থক এক কলম সৈনিক এবং দূরদৃষ্টিসম্পন্ন রাজনৈতিক বিশ্লেষক।

সাংবাদিক এবিএম মূসা তাঁর কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ লাভ করেছেন বেশ কিছু পুরস্কার ও ফেলোশিপ। তাঁর উল্লেখযোগ্য পুরস্কার ও ফেলোশিপের মধ্যে রয়েছে; 'ইন্টারন্যাশনাল প্রেস ইনস্টিটিউট জুরিখ (আইপিএ)-এর প্রেস অ্যাওয়ার্ড, 'একুশে পদক' (১৯৯৯), জেফারসন ফেলোশিপ (১৯৭০), কমনওয়েলথ প্রেস ইউনিয়ন ফেলোশিপ (১৯৬১) ইত্যাদি। লন্ডনস্থ কমনওয়েলথ প্রেস ইউনিয়ন থেকে তিনি সাংবাদিকতায় ডিপ্লোমা অর্জন করেছেন। পেশাগত কারণে তিনি পৃথিবীর বহু দেশ ভ্রমন করেছেন।

এবিএম মূসা বিয়ে করেন ১৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৫ সালে। স্ত্রী সেতারা মূসা সাংবাদিকতা ও সমাজসেবায় ব্যয় করেছেন জীবনের অনেকটা সময়। এবিএম মূসা এক পুত্র ও তিন কন্যার জনক। প্রখ্যাত ও স্বনামধন্য সাংবাদিক মরহুম আব্দুস সালাম-এর তিনি প্রথম জামাতা।

পথিকৃৎ, অগ্রপথিক, দেশবরেণ্য ও প্রথিতযশা সাংবাদিক – এবিএম মূসাকে ঠিক কী বিশেষণে অভিহিত করা যায়? তিরাশি বছর বয়সের কোঠায় দাড়িয়ে এখনো যেভাবে তিনি ইলেক্ট্রনিক ও প্রিন্ট –দু'মাধ্যমেই সোচ্চার পদচারণা অব্যাহত রেখেছেন, সে বিবেচনায় বাংলাদেশের গণমাধ্যম জগতের জীবন্ত কিংবদন্তি বললে কি খুব বেশি বলা হয়!

তথ্যসূত্রঃ

১. আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী, মূসার জন্মদিনে একটি ইতিহাসকে স্মরণ করা চলে, প্রথম আলো, ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০০৭
২. শেখ আবদুস সালাম, বাংলাদেশের গণমাধ্যম ও সাংবাদিকতায় আলোকিতজনেরা, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা ২০১১
৩. এবিএম মূসা, আমার সাংবাদিকতার আদিপর্ব, মানবজমিন, ঈদ আনন্দ ২০১৩
৪. মুনির রানা, আমাদের সাংবাদিকতার এক অগ্রপথিক এবিএম মূসা, ছুটির দিনে, প্রথম আলো
৫. মীর মাসরুর জামান রনি ও সাইদুজ্জামান শাহীন।

সাংবাদিকতার অক্লান্ত যোদ্ধা এবিএম মূসা শ্রদ্ধাঞ্জলি

আতাউস সামাদ

মূসা ভাই অর্থাৎ বিখ্যাত সাংবাদিক এবিএম মূসাকে নিয়ে এর আগেও লিখেছি, তবে সেগুলোতে হয়তো বা আবেগ প্রাধান্য পেয়েছে, কারণ তাঁর সঙ্গে আমার সম্পর্ক হচ্ছে গুরু-শিষ্য, ত্রাতা-বিপদাপন্ন, সেনাপতি-সৈনিক, সহযোদ্ধা, দলপতি-কর্মী, বড় ভাই-ছোট ভাই এবং সময়ে সময়ে যেন বা বন্ধুত্বের। মোটকথা, তিনি প্রকৃত অর্থেই আমার ও আমার পরিবারের আপনজন। এই লেখার শুরুতেই এ কথাগুলো বলে নিলাম এ জন্য যে মূসা ভাই আজ আমার চোখের সামনে বারবার আসছেন বাংলাদেশের জাতীয় প্রেক্ষাপটে।

বাংলাদেশের ইতিহাসের সঙ্গে সংবাদপত্র ও সাংবাদিকতা অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে আছে। বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাঙালি মুসলমানদের ঐতিহ্য, আশা-হতাশা, আনন্দ-বেদনা এবং তাদের আকাঙ্ক্ষা প্রতিফলিত হয়েছে প্রথমে কিছু সাময়িক পত্রিকার পাতায়, পরে কয়েকটি দৈনিক পত্রিকার মাধ্যমে। গত শতাব্দীর ষাটের দশকের পুরোটাজুড়েই সাংবাদিকদের একদিকে সংগ্রাম করতে হয়েছে গণমাধ্যমের ন্যূনতম স্বাধীনতা আদায় করার জন্য, অন্যদিকে পূর্ব বাংলার বাঙালিদের মনে প্রথমে স্বাধিকার ও পরে স্বাধীনতার জন্য অদম্য আগ্রহ সৃষ্টি করার লক্ষ্যে। আবদুস সালাম, তোফাজ্জল হোসেন (মানিক মিয়া) জহুর হোসেন চৌধুরী ও শহীদুল্লা কায়সারের মতো সাহসী ও যোগ্য সম্পাদকের পাশাপাশি সিরাজুদ্দীন হোসেন, কে জি মুস্তাফা, খোন্দকার আবু তালেব, এবিএম মূসা, ফয়েজ আহমেদ, নিজামুদ্দীন, এম আর আখতার, আওয়াল খান, আলী আশরাফ, সন্তোষ গুপ্ত, এনায়েতুল্লাহ খান, শহীদুল হক ও বজলুর রহমানের মতো লড়াকু ও প্রতিভাবান সাংবাদিকের প্রয়োজন পড়েছে যুদ্ধটা করার জন্য। ওই প্রজন্মের সাংবাদিকদের মধ্যে এখনো কর্মরত ও সক্রিয় আছেন মূসা ভাই ও তোয়াব খান। ফয়েজ ভাই বয়স ও অসুস্থতার দরুন এখন বেশির ভাগ সময় কাটান ঘরে, তবে লেখা একেবারে বন্ধ করেননি। যে প্রজন্মের সাংবাদিকদের কথা বললাম, তাঁরা একাধারে বাংলাদেশে সাংবাদিকতা পেশা তিলে তিলে গড়ে তুলেছেন এবং নীরবে একটা স্বাধীন দেশ তথা বাংলাদেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে কাজ করে গেছেন। সেই সময়কার সংবাদপত্র এবং সাংবাদিকতায় তাঁদের কাজ বাংলাদেশের ইতিহাসে অবিচ্ছেদ্য অংশ। আমরা ভাগ্যবান যে মূসা ভাই, ফয়েজ ভাই ও তোয়াব ভাই এখনো আমাদের মধ্যে আছেন।

মূসা ভাইয়ের সঙ্গে যাঁরা কাজ করেছেন, তাঁরা ভেতর থেকে দেখেছেন যে সরকারি নিষেধাজ্ঞার কঠিন ও উঁচু দেয়াল ডিঙ্গিয়ে কীভাবে তথ্য জনগণের কাছে পৌছে দেওয়া যায়। সমধিক গুরুত্বপূর্ণ এ-ও যে কোন খবরটার প্রতি এই মুহূর্তে সর্বাধিক পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা প্রয়োজন, ত্বরিত গতিতে সেই সিদ্ধান্ত নিয়ে সেই লক্ষ্যে দরকারি ব্যবস্থা নেওয়া। এই কাজগুলো মূসা ভাই করতেন প্রায় অবলীলায়। এটা ছিল তাঁর স্বভাবজাত।

১৯৬৬ সালে ৭ জুন শেখ মুজিব ঘোষিত ঐতিহাসিক ছয় দফা দাবি আদায়ের লক্ষ্যে এবং দলের বন্দী নেতাদের মুক্তির জন্য পূর্ব পাকিস্তানজুড়ে হরতাল ডেকেছিল আওয়ামী লীগ। খুবই উত্তেজনাপূর্ণ ওই দিনে সকালের দিকেই পুলিশ বিক্ষোভকারীদের ওপর ঢাকা শহর ও আরও কয়েক জায়গায় গুলি চালায় এবং এর ফলে অন্তত ১০ জন নিহত হন। সে দিন আমার দায়িত্ব ছিল তেজগাঁও শিল্পাঞ্চলের অবস্থা ও শ্রমিক বিক্ষোভের রিপোর্ট করা। এখানে গুলি চলার অল্প পরই আমাদের গাড়ীর চালক তফাজ্জলের

সহায়তায় অফিসে পৌঁছে দেখি, মূসা ভাই (তখন তিনি অবজারভার-এর বার্তা সম্পাদক) নিজেই ছাপাখানায় দাঁড়িয়ে, তক্ষুণি অবজারভার-এর একটি 'টেলিগ্রাম' (জরুরি বিশেষ সংখ্যা, টেলিভিশনে এখনকার ব্রেকিং নিউজের মতো অনেকটা) বের করার কাজ করছেন। আমরা রিপোর্টাররা যেসব খবর এনেছি, সেগুলো আমাদের ছোট ছোট স্লিপে লিখে দিতে নির্দেশ দিলেন তিনি। ছাপাখানায় দাঁড়িয়েই সেগুলো সম্পাদনা করে, কম্পোজ করিয়ে, পাতা সাজিয়ে, কাগজে ছাপা শুরু করে দিয়ে দোতালার অফিসে উঠে এলেন তিনি। বললেন, 'সরকার তো সেন্সরশিপ আরোপ করবে, তাই সেই নির্দেশ আশার আগেই কাগজ বের করে দিলাম।' মূসা ভাই ঠিকই ধরেছিলেন। ৭ জুনের আন্দোলনের খবর ছাপার ওপর নিষেধাজ্ঞা এল বিকেলের আগেই। সন্ধ্যার পর সরকার একটা বিজ্ঞপ্তি দিল দিনের ঘটনা নিয়ে। সরকারি হুকুম হলো, শুধু এই বিজ্ঞপ্তি ছাপা যাবে, আর কিছু নয়। বার্তা সম্পাদক মূসা ভাই ওই বিজ্ঞপ্তি সেদিনের প্রধান খবর হিসেবে ছাপলেন। তবে সেটার ওপর শিরোনাম লিখলেন 'Its a government pressnote' (সংবাদটি একটি সরকারি প্রেসনোট)। ফলে পাঠকেরা সেই খবর আর বিশ্বাস করলেন না। অবজারভারকে এ জন্য অনেক চাপের মধ্যে পড়তে হয়েছিল। সরকার বিজ্ঞাপন দেওয়াও বন্ধ করে দেয়। এখানে একটা কথা অবশ্যই বলতে হয় এবং মূসা ভাইও তা বলেন। পত্রিকার সম্পাদক ও প্রকাশকের সমর্থন ছাড়া এসব কাজ বার্তা সম্পাদক বা প্রতিবেদক করতে পারবেন না। অবজারভার-এ মূসা ভাইয়ের এসব সিদ্ধান্তের প্রতি সম্পাদক আবদুস সালাম ও মালিক হামিদুল চৌধুরীর পূর্ণ অনুমতি ছিল। তা হলো, তবে শুধু অবজারভার নয়, মূসা ভাই বিবিসি ও সানডে টাইমস-এর সংবাদদাতা হওয়ার সুযোগটাও স্বাধিকার আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য পুরোপুরি ব্যবহার করেছিলেন। ১৯৭০ সালের নভেম্বরে বাংলার দক্ষিণাঞ্চলে যে মারাত্মক সাইক্লোন আঘাত হানে, তাতে লাখ লাখ লোক মারা যায়। পাকিস্তান সরকার এ বিষয়ে তথ্য গোপন করছিল। মূসা ভাই তখন বিভিন্ন সূত্র থেকে সংগ্রহ করা তথ্যের ভিত্তিতে বিবিসি ও সানডে টাইমস-এ মৃতের পরিসংখ্যান পাঠাতে থাকেন। বিবিসিতে প্রচারিত খরর হিসেবে ওই পরিসংখ্যান ঢাকায় অবজারভার ও অন্য আরও কাগজে প্রকাশিত হতে থাকে। আর জনগণ কেন্দ্রীয় সরকার ও সেনাশাসক ইয়াহিয়া খান বাংলার এই ভাগ্যাহত জনগণের প্রতি যে চরম ঔদাসীন্য দেখাচ্ছিলেন, তা নিয়ে ফুঁসতে থাকে। সানডে টাইমস-এর খবর উল্লেখ করে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এক সংবাদ সম্মেলনে বলেন, 'ঘূর্ণিঝড়ে ১০ লাখ লোক মৃত্যুবরণ করেছে, প্রয়োজনে আরও ১০ লাখ মানুষ বাংলার স্বাধিকার অর্জনের জন্য প্রাণ দেবে।

বিবিসিতে খবর পাঠানোর এমন আরও সুযোগ নিয়েছেন মূসা ভাই। মনে পড়ে ১৯৭১-এর মার্চে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ডাকে অসহযোগ আন্দোলনের সময় ঢাকা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি বি এ সিদ্দিকী নবনিযুক্ত গভর্নর সামরিক অফিসার জেনারেল টিক্কা খানকে শপথ দিতে রাজি হননি। বিচারপতি সিদ্দিকীর সঙ্গে মূসা ভাইয়ের ঘনিষ্ঠতা ছিল। তিনি মূসা ভাইকে ডেকে নিয়ে অনুরোধ করেছিলেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের কাছ থেকে জেনে দিতে যে শপথ দেওয়ার দায়িত্বের ব্যাপারে তিনি কী করতে পারেন। মূসা ভাই গেলেন শেখ সাহেবের কাছে। তিনি বললেন, প্রধান বিচারপতি যেন কালক্ষেপণ করেন। সেই পরামর্শ মোতাবেক জেনারেল টিক্কা খানকে ওই সময় শপথ দান করতে অপারগতা জানালেন প্রধান বিচারপতি বি এ সিদ্দিকী। কিন্তু ওই খবর কোনো সূত্র ছাড়া ঢাকার পত্রিকাগুলো ছাপাবে কীভাবে। মূসা ভাই তখন বিবিসিতে খবরটা পাঠালেন। অবজারভার এবং আরও কয়েকটি কাগজ বিবিসি উল্লেখ করে সংবাদ প্রকাশ করল যে বিচারপতি সিদ্দিকী জেনারেল টিক্কা খানকে শপথ দেননি। ২৬ মার্চ ১৯৭১, পাকিস্তানি সেনারা বাংলাদেশে সামরিক অভিযান শুরু করার পর অবশ্য বিচারপতি বি এম সিদ্দিকী বাধ্য হয়েছিলেন টিক্কা খানকে গভর্নরের শপথ দিতে। ওই টিক্কা খানই 'বাংলার কসাই' পরিচিতি পেয়েছিলেন এখানে তাঁর নৃশংসতার জন্য।

মুক্তিযুদ্ধ শুরুর কিছুদিন পর মূসা ভাই ব্যাংকক চলে যেতে সক্ষম হন। মূসা ভাই বিদেশে প্রখ্যাত ভারতীয় সাংবাদিক অমিতাভ চৌধুরীর উদ্যোগে ও সহায়তায় এশিয়ান নিউজ সার্ভিস নামে একটি বার্তা সংস্থা চালু করতে সমর্থ হন। এই বার্তা সংস্থার প্রধান কাজ ছিল বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের খবর সংগ্রহ করে পশ্চিমা গণমাধ্যমকে সরবরাহ করা। সেই সময় বিবিসি এই সংস্থার অনেক খবর ব্যবহার করেছিল। আমার মনে পড়ে, একাত্তরের নভেম্বরের শেষে বা ডিসেম্বরের শুরুতে বিবিসিতে মূসা ভাইয়ের পাঠানো সংবাদ উল্লেখ করে প্রচার করা হয়েছিল যে, পাকিস্তানে বন্দী শেখ মুজিবুর রহমানের মেজো ছেলে শেখ জামাল যশোর রণাঙ্গনে যুদ্ধ করছেন। যুদ্ধের আরও খবরের মধ্যে কিশোর মুক্তিযোদ্ধাদের লড়াইয়ের খবরও রণাঙ্গন থেকে পাঠিয়েছিলেন মূসা ভাই।

মূসা ভাই আমাদের জন্যও অনেক করেছেন। নিজে বিলেতে যা শিখে এসেছেন, আমাদের হাতে ধরে তা লিখিয়েছেন। বড় বড় খবরের উৎস হিসেবে কাজ করে পরিপূর্ণ ব্রিফ দিয়েছেন। সরেজমিনে রিপোর্টিংয়ের গুরুত্ব কর্মফলের মধ্য দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন। আমাকে তো দুবার নিজে গাড়ি চালিয়ে ঢাকার বাইরে (ফতুল্লা ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া) একটা লঞ্চডুবি ও একটা ট্রেন দুর্ঘটনার স্থানে নিয়ে গেছেন, নিয়ে এসেছেন, এমনকি নোট নিয়েছেন। আর রিপোর্টগুলো বেরিয়েছে আমার বাই-লাইনে। এখানে উল্লেখ করি, ঢাকার দৈনিক পত্রিকায় ভালো রিপোর্টে রিপোর্টারদের নাম দেওয়ার প্রথা মূসা ভাইই চালু করেন অবজারভার পত্রিকায়। সেই সঙ্গে নাটকীয় আলোকচিত্রের ব্যবহার। ছবিতে নাটকীয়তা আনার জন্য কাঁচি, ব্লেড ও আলপিন ব্যবহার করে সম্পাদনা করতে দেখেছি তাঁকে।

মূসা ভাইয়ের কর্মজগতের ব্যাপ্তি অনেক। পাকিস্তান আমলে তিনি যে শহীদ সিরাজুদ্দীন হোসেন ও প্রয়াত কে জি মুস্তাফার সঙ্গে অগ্রভাগে থেকে সংবাদপত্রের স্বাধীনতার জন্য নিরন্তর সংগ্রাম করেছেন। আইয়ুব খানের কালাকানুন প্রেস অ্যান্ড পাবলিকেশন অর্ডিন্যান্সের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে ১৯৬২ সালে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের সাংবাদিক ইউনিয়নের ডাকে আমরা রাজপথে মিছিল করেছিলাম। ইউনিয়নের নেতারা সম্পাদকদেরও রাজি করিয়েছিলেন ওই শোভাযাত্রায় যোগ দিতে। বৃদ্ধ মওলানা আকরাম খাঁ-ও এসেছিলেন। তাঁকে মোটরগাড়িতে বসিয়ে শোভাযাত্রায় শামিল করা হয়েছিল। গাড়িটি ছিল মূসা ভাইয়ের ছোট্ট fiat-৫০০ মডেলের নীল রঙের। ওটার হুড খুলে দেওয়া হয়েছিল, যাতে মওলানা আকরাম খাঁ'কে দেখা যায়। মূসা ভাই নিজেই চালাচ্ছিলেন সেই গাড়ি।

মূসা ভাই সম্পর্কে এতগুলো কাহিনী যে মনে করলাম, তাঁর তিনটি কারণ আছে। প্রথমত, সমস্যা ও বিপৎসংকুল সময়ে মূসা ভাইয়ের সাংবাদিকতার ধরন সম্পর্কে পাঠকদের ধারণা দেওয়া। দ্বিতীয়ত, সেই সময়টা সাংবাদিকদের জন্য কেমন ছিল, তা কিছুটা তুলে ধরা। আর তৃতীয়ত, মূসা ভাইয়ের কাছ থেকে এখনো সম্পাদকেরা ও তাঁদের অধীন সাংবাদিকেরা অনেক কিছু জেনে নিতে ও লিখে নিতে পারেন, তা বলা। মূসা ভাই আমাদের সব সময় বলতেন, কোনো সমস্যা নিয়ে রিপোর্ট করলে শুধু সমস্যাটি ও তার কারণ লিখলেই হবে না, সেটি সমাধান করা যায় কীভাবে, তা-ও খুঁজে বের করে বলতে হবে। তিনি এখন কলামিস্ট হিসেবে যা লেখেন, তাতে ওই সূত্রটি মেনে চলেন। টেলিভিশনে সংবাদভাষ্য দেওয়ার সময়ও সেভাবে বলতে চেষ্টা করেন। মধ্যরাতেও টেলিভিশনে মূসা ভাই যে সজাগ দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দেন, তা দেখে বিস্মিত হই।

মূসা ভাইকে গভীর শ্রদ্ধা ও শুভেচ্ছা জানাই। ভাবি সিতারা মূসাকেও শুভেচ্ছা জানাই। তাঁরা দুজন আমাদের জন্য আলোকবর্তিকা হয়ে থাকুক আরও বহু দিন, আল্লাহর কাছে এই প্রার্থনা করি।

সৌজন্যে: প্রথম আলো, ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১১

বিভাজনের বাইরে এক মূসাভাই

রিয়াজউদ্দিন আহমেদ

আজকের সাংবাদিকতা জগতে এক মহীরুহ আমাদের প্রিয় মূসাভাই। সবার কাছে ও সব মহলে সমান গ্রহণযোগ্য একজন নির্ভীক সাংবাদিক। রাজনৈতিক বিভাজনের এই সমাজে কারও পক্ষে সবার কাছে গ্রহণযোগ্য হওয়া অতি দুরূহ। এই বিভাজনের সমাজে আপনি হয় আমার সঙ্গে, না হয় আমার বিপক্ষে। এই বিভাজনের সীমারেখা অতিক্রম করতে পেরেছেন এবিএম মূসা।

সাংবাদিকতা জগতের সর্বত্র বিচরণ করেছেন অর্ধশতাব্দীরও অধিক কাল। সাব-এডিটর ও রিপোর্টার, এমনকি ক্রীড়া প্রতিবেদক থেকে সফল নিউজ এডিটর, পরে সম্পাদক, বিদেশি পত্রিকার প্রতিনিধি, একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে রণাঙ্গনের সংবাদদাতা। এখন সবচেয়ে জনপ্রিয়তা পেয়েছেন কলামিস্ট মূসাভাই।

এই মূসাভাই আগামীকাল ২৮ ফেব্রুয়ারি ৮০ বছরে পা রাখবেন। এই দীর্ঘ সময়ের অর্ধেকটা আমি নানাভাবে তাঁর খুব কাছে কাছে ছিলাম। এখনো আছি প্রেসক্লাবের আড্ডায়, প্রেস কনফারেন্সে, জনপ্রিয় টিভি টকশোতে আর সামাজিক অনুষ্ঠানে। শুরুটা হয়েছিল ষাটের দশকের শেষ দিকে, বিশ্ববিদ্যালয়ের লেখাপড়া শেষ করে আমি যখন তদানীন্তন *পাকিস্তান অবজারভার*-এ যোগ দিই। সাংবাদিকতা শুরু করেছিলাম অনুসন্ধানী রিপোর্টিং করার জন্য রিসার্চ সেলে। এক বছর কাজ করার পর *অবজারভার* পত্রিকার রিপোর্টিং টিমে যোগদানের আদেশ। এই রোমাঞ্চকর অবস্থার মধ্যেও দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়ি। কারণ মূসাভাই তখন জাঁদরেল বার্তা সম্পাদক। অফিসে শুধু তাঁর গলার আওয়াজ শুনলেই আমরা যারা নতুন, ভয়ে তাঁর দিকে তাকাতেও পারতাম না। তাই যখন *অবজারভার*-এর ম্যানেজিং এডিটর মাহবুবুল হক আমাকে রিপোর্টিংয়ে যোগ দিতে বললেন, তখন দ্বিধায় পড়ে গেলাম। ভাবলাম, তাঁর রক্তচক্ষুর সামনে দাঁড়াতেই পারব কি না সংশয় রয়েছে, রিপোর্ট লিখব কেমন করে? কিন্তু মাহবুব ভাই মূসাভাইকে ডাকলেন। বললেন, 'রিয়াজ অর্থনৈতিক বিষয়ে রিপোর্ট করবে। তোমাকে সে ভয় পায়, ওকে কিছু বলো না।' মূসাভাই চোখ বড় বড় করে কটমট করে তাকালেন। তবে কিছুই বললেন না।

মরহুম শহীদুল হক, এনায়েতউল্লাহ খান (হলিডে), আতাউস সামাদ, আবদুর রহিম টাইপরাইটারের সামনে। ডেস্কে বসে আছেন মূসাভাই, কে জি (মুস্তাফা) ভাই; ভয়ে টাইপরাইটার চলে না। এর মধ্যে মূসাভাই কাছে এলেন, কী রিপোর্ট করতে হবে বললেন, আরও কিছু নির্দেশ দিলেন–কী সাইজের কাগজে টাইপ করতে হবে, কীভাবে রিপোর্ট শুরু করতে হবে–শিক্ষকের মতো এসব বলে চলে গেলেন। কাজ করতে গিয়ে দেখি, সে এক অন্য মূসাভাই, যাঁর ছিল সাংবাদিকতায় অভিজ্ঞতা আর পাণ্ডিত্য গভীর, প্রখর নিউজ সেন্স, আর সহকর্মীদের জন্য মমত্ববোধ। অনেক ঘটনার মধ্যে একটা ঘটনার উল্লেখ করলেই বোঝা যাবে তাঁর সাহসের পরিধি। মহাপ্রলয়ের বছর। ১৯৭০ সাল। ঘূর্ণিঝড় আর জলোচ্ছ্বাসে উপকূলীয় অঞ্চলে লাখ লাখ লোকের মৃত্যু। মূসাভাই বললেন, ব্রিটিশ রয়্যাল নেভির হেলিকপ্টারে আমাকে পটুয়াখালী যেতে হবে। পরদিন সকালে পটুয়াখালী হয়ে চর বাইসদিয়ার ওপারে গভীর সমুদ্রে ব্রিটিশ রণতরী এইচএমএস ইনট্রিপিডে গেলাম। ওই যুদ্ধজাহাজেই হেলিকপ্টার অবতরণ করে। ওই জাহাজে হাজার হাজার যানবাহন, রাবার ডিঙি আর সেনা ত্রাণকাজে নিয়োজিত। সন্ধ্যায় অফিসে ফিরে লিখতে বসলাম। সেনা জনসংযোগ বিভাগ থেকে ফোন। মেজর সালেক সিদ্দিকী (২৫ মার্চ, '৭১-এ ঢাকায় ছিলেন এবং নয় মাস সব অভিজ্ঞতার ওপর 'Witness to Surrender' বই লেখেন) বললেন

রিপোর্টটি কীভাবে লিখতে হবে। কারণ তিনি জানতেন, রিপোর্টে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ত্রাণকাজের সমালোচনা করা হবে। মূসাভাইকে আমি মেজর সালেকের নির্দেশের কথা বললাম। তিনি সঙ্গে সঙ্গে ফোন তুলে মেজর সালেককে বললেন, 'নাক গলাবেন না।' ১৯৭১-এর ২৫ মার্চের পর অবশ্য সব বদলে যায়। সালেক সিদ্দিকীদের কথায়ই তখন সব চলত। কিন্তু মূসাভাই তাঁর কথায় চলতেন না। অবশ্য তখনকার অবস্থায় তা প্রতিহত করাও ছিল দুরূহ ব্যাপার। জুন মাসের কোনো এক সময় মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেওয়ার জন্য তিনি দেশ ত্যাগ করেন। আমিও ঢাকা ছেড়ে চলে যাই।

মূসাভাইয়ের সংবাদ পরিবেশনায় অসংখ্য মুনশিয়ানার আরেকটি উদাহরণ দেব। ষাটের দশকে *পাকিস্তান অবজারভার* ছিল আইয়ুব শাহীর ত্রাস। সারা পাকিস্তানে এই কাগজের প্রভাব ছিল অনেক। সেই কাগজের নিউজ এডিটর মূসাভাই। তখন শুনতাম, পাকিস্তানে যে কয়জন তুখোড় নিউজ এডিটর ছিলেন, মুসাভাই ছিলেন তাঁদের একজন। দ্রুততার সঙ্গে কপি এডিটিং, চমকপ্রদ হেডিং আর রিপোর্ট এডিটিং ছিল দেখার মতো। একটি হেডিং আমার আজও মনে আছে। একজন লোক ৫০ টাকা দিয়ে টিকিট কাটলেন, গন্তব্যে গেলেন। তিনি সেখানে মারা যান। লাশ আনতে একই উড়োজাহাজ দাবি করল কয়েক শ টাকা ভাড়া। মূসাভাই হেডিং দিলেন 'Costly when dead' (জীবিতের চেয়ে লাশের মূল্য বেশি)। আবার ১৯৭০ সালের নির্বাচনে কে কত বড় বাঙালি, তা প্রমাণ করার প্রতিযোগিতা। এর মধ্যে একজন রিপোর্ট করলেন–খাজা খয়ের উদ্দিন বক্তৃতায় বলেছেন, 'কোন বোলতা হামি বাঙ্গালি না, হামি ভি বাঙ্গালি আছে।' মূসাভাই কপিটি এডিট করে খাজা খয়ের উদ্দিনের এ কথাটি বাংলায় ইংরেজির ভেতরে পাঞ্চ করে দিলেন। তাঁর সম্পাদনার এই মুনশিয়ানা, কৌশলী পরিবেশনা সেই সময়ে ছিল আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে। এ ধরনের আরও অনেক মজার ঘটনা আছে মূসাভাইকে নিয়ে।

যাঁর রক্তচক্ষুর ভয়ে রিপোর্টার হতে চাইনি, সেই মূসাভাইকে পাই বড়ভাই, সাংবাদিকতার গুরু আর একজন অকৃত্রিম সুহৃদ হিসেবে। তাঁর সঙ্গে মেশার জন্য বয়স কোনো বাধা নয়। ৮০ বছর বয়সে পা দিয়েও প্রেসক্লাব মাতিয়ে রাখেন। ছোটবড় সবার সঙ্গে আড্ডায় মেতে ওঠেন। তিনবার তিনি প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক ও চারবার সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায়। ক্লাব তাঁকে আজীবন সদস্য পদের সম্মাননা দিয়েছে।

মূসাভাই রাজনৈতিক ও গোষ্ঠীগত সংকীর্ণ পরিচয়ের ঊর্ধ্বে উঠে 'সবার মূসাভাই' হতে পেরেছেন। দলমতের ঊর্ধ্বে উঠে রাজনৈতিক অঙ্গনের সকল দলের সমর্থক ও নেতা-নেত্রীর সমান শ্রদ্ধা, ভালোবাসা, সম্মান এবং সবার কাছে সমান গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছেন ও পাচ্ছেন। তাই তাঁর অবস্থান এখন মুরব্বির আসনে। আর আমাদের সাংবাদিকদের কাছে তিনি হয়ে আছেন শুধু প্রিয় মূসাভাই, নির্ভীক ও আদর্শবাদী সাংবাদিকতার আদর্শবান অভিভাবক। আশিতে পা-দেওয়া আমাদের মূসাভাই দীর্ঘজীবী হোন।

সৌজন্যে: প্রথম আলো, ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০১০

মেয়ের চোখে বাবা এবি এম মূসা

পারভীন সুলতানা ঝুমা

একজন ব্যক্তিমানুষ সব দিক দিয়ে সফল – এমন দাবি ক'জন করতে পারেন? পারিবারিক জীবনে যিনি একশ ভাগ দায়িত্ব পালনে পারঙ্গম, পেশাজীবনে তাঁর পক্ষে হয়তো সাফল্যের শেষ সিঁড়ি অবধি পৌঁছানো সম্ভব হয় না। আবার, পারিবারিক ও পেশাগত দায়িত্ব পালনে কৃতিত্বের জন্য যিনি অনেকেরই ঈর্ষার পাত্র হিসেবে বিবেচিত, তিনি হয়তো অন্যদের কাছে ব্যক্তিমানুষ হিসেবে রীতিমতো অসামাজিক বলে মূল্যায়িত হচ্ছেন। কিন্তু পরিবার, পেশা এবং সমাজ জীবন – এই তিন ক্ষেত্রেই আমার বাবা যে পুরো ষোল আনা দায়িত্ব ও কর্তব্য পরায়ন – এমনকি তিরাশি বছর বয়সের সীমানায় দাড়িয়েও বাবা তা পালন করে যাচ্ছেন তা সত্যি এক বিস্ময়কর দৃষ্টান্ত।

সাংবাদিক পিতা-মাতার সন্তানরা সাধারণত তাদের বাবা বা মায়ের সান্নিধ্য কমই পেয়ে থাকেন। এ প্রসঙ্গে বাবার মুখে শোনা একটি গল্প এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে: একজন সাংবাদিক ভদ্রলোক দোকানে গেছেন ছেলের জামা কিনতে। ছেলে কত বড়? দোকানি জিজ্ঞেস করলে সাংবাদিক বাবা ছেলের উচ্চতা দেখাতে পারছিলেন না। দু'হাত প্রসারিত করে মাছের আকৃতি দেখানোর মতো ছেলের মাপ দেখালেন। দোকানী অবাক হয়ে বলল, 'আপনার ছেলের মাপ আপনি জানেন না?' ভদ্রলোক বললেন, কী করব বলুন? সকালে যখন অফিসে যাই তখন ছেলে ঘুমে, রাতে যখন বাড়ি ফিরি তখনও ছেলে ঘুমে। তাই ছেলের উচ্চতা দেখাতে পারছি না, প্রস্থ দেখাতে হচ্ছে।

আমরা শৈশবে বাবাকে পেয়েছি পাকিস্তান অবজারভারের জাঁদরেল বার্তা সম্পাদক হিসেবে; এরপর বিটিভির মহাপরিচালক, মর্নিং নিউজের সম্পাদক এবং একসময়ে সংসদ সদস্য হিসেবে। আরও বড় হয়ে তাকে দেখেছি জাতিসংঘের কর্মকর্তা, পিআইবির মহাপরিচালক, বাসসের প্রধান সম্পাদক এবং মহাব্যবস্থাপকের দায়িত্ব নিয়ে দিবানিশি ব্যস্ত থাকতে। যখন বাবা কিছুটা অবসর পেলেন তখন আমরা ব্যস্ত আমাদের পেশা, সংসার আর সন্তানদের নিয়ে; বাবা প্রচণ্ড ব্যস্ততার মাঝেও আমাদের যে সময় দিতেন, তার তুলনায় অতি স্বল্প ব্যস্ত হয়েও আমরা সে সময়টুকুও দিতে পারছি না তাঁকে। এটাই হচ্ছে পিতা-মাতা আর সন্তানদের মধ্যকার সম্পর্কের স্বরূপ।

গল্পের সেই সাংবাদিক ভদ্রলোকের ছেলের মতো সকালে স্কুলে যাওয়ার সময় বাবাকে ঘুমন্ত অবস্থায় পেতাম। প্রতি রাতে বাড়ি ফিরতে ফিরতে বাবার রাত দুটো-তিনটে বাজত। তখন হ্যান্ড কম্পোজের যুগ। দুপুরে খেতে আসতেন বাসায়, এরপর সন্ধ্যায় যেতেন অফিসে। এ সময়টুকু পরিবারকে দিতেন কড়ায়-গণ্ডায়। প্রতি বিকেলে বাবা-মার সঙ্গে আমরা বেড়াতে যেতাম হয় বাবার কোনো বন্ধুর বাড়ি বা কোনো আত্মীয়ের বাসায় অথবা আইসক্রিম পার্লারে। তবে বেশি যাওয়া পড়ত প্রেস ক্লাবে। সেই লাল ইটের প্রেস ক্লাবের সামনের লনে জমত বড়দের আড্ডা। আর আমরা ছোটরা আন্ডাপুরি আর কোকাকোলা খেতে খেতে দোলনা আর স্লিপারে চড়তাম মজা করে। ইউসিস-এরর সাবেক জনসংযোগ কর্মকর্তা নুরুল ইসলাম (পরবর্তীকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংযোগ কর্মকর্তা), সাংবাদিক শহিদুল হক (পরবর্তীকালে বাংলাদেশ টাইমসের সম্পাদক ও পিআইবি মহাপরিচালক), বিখ্যাত সাতারু ব্রজেন দাস, সে সময়কার পিআইএ'র জনসংযোগ কর্মকর্তা মহিউদ্দিন চৌধুরী প্রমুখ চাচারা নিয়মিত সপরিবারে আসতেন প্রেস ক্লাবে। সন্ধ্যায় আমাদের বাড়িতে পৌঁছিয়ে বাবা ছুটতেন অবজারভার অফিসে। সেখানে

বাবা কড়া বার্তা সম্পাদক, ধমকের ওপর রাখতেন অধস্তন থেকে সহকর্মী, এমনকি আমার নানা সম্পাদক আবদুস সালামকে। কিন্তু আমরা বাবার ধমক খেয়েছি কদাচিৎ। একটু বড় চোখ করে তাকালে বা ভারি গলায় কথা বললেই বুঝতে পারতাম বাবার মুড অফ। তখন তফাতে থাকাই উত্তম। কোনো বিষয়ে বাবার কোনো শাসন আমরা পাইনি। এ পর্বটা তিনি পুরোপুরি মায়ের ওপর ছেড়ে দিতেন। শুধু শাসন নয়, আমাদের ভাইবোনদের পড়াশোনা, বিয়েশাদি – সব মায়েরই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সম্পন্ন হতো। মা ছিলেন আমাদের পরিবারের সম্রাজ্ঞী। তার ওপর কেউ কথা বলতে পারত না। একজন স্বামী তার স্ত্রীকে কতটা সম্মান দেখাতে পারে আমার বাবা তার সর্বোত্তম উদাহরণ। সেজন্য আমার ছোট ভাইয়ের বিয়ের পর বাবা তাকে ডেকে একটি কথাই বলেছিলেন, 'স্ত্রীকে সব সময় শ্রদ্ধা করবে।'

সংসারের সম্রাজ্ঞী মা সাত বছর আগে পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হয়ে পঙ্গু জীবনযাপন করছেন। মায়ের এই পঙ্গুত্ব বাবার স্বাস্থ্য এবং মনকে চরমভাবে আঘাত করেছে। কারণ বাবাকে দেখেছি শুধু সংসার জীবন নয়, পেশাগত জীবনের প্রতিটি বিষয়ে মায়ের পরামর্শ নিতে।

জীবন সঙ্গিনীর প্রতি শুধু শ্রদ্ধা নয়, বাবাকে বলা যায় রোমান্টিক পুরুষের প্রতিভু। ছোটবেলা থেকে এবং এখনও দেখছি ১৪ ফেব্রুয়ারি তাদের বিয়ের দিনে বাবা মাকে একটি কার্ড দেবেনই দেবেন। সে সময় তো আর ঢাকায় 'টু মাই বিলাভড ওয়াইফ' লেখা কার্ড পাওয়া যেত না। যখনই বিদেশে গেছেন আগেভাগে সে ধরনের কার্ড সংগ্রহ করে আনতেন। ১৪ ফেব্রুয়ারিতে বাড়ির পোস্টবক্সে আস্তে করে কার্ডটি ঢুকিয়ে রাখতেন। ঈদের সময় আগের দিন মায়ের জন্য শাড়ি কিনে খাটের তোষকের নিচে লুকিয়ে রাখতেন, যাতে পরের দিন বিছানা করতে গিয়ে মা শাড়িটা দেখতে পান। এখনও ঈদের আগের দিন নিজে শাড়ি কিনে আনেন, কিন্তু তোষকের নিচে আর রাখেন না। মা তো এখন আর বিছানা করতে পারেন না।

আমাদের চার ভাইবোনের কারোর জন্মদিন বাবাকে কখনও ভুলতে দেখিনি। আমাদের জন্মদিন হতো ঘটা করে। সংবাদ সংগ্রহের জন্য বাবাকে প্রায় বিদেশে যেতে হতো। ছেলেমেয়েদের কারোর জন্মদিনে বিদেশ সফর থাকলে প্রাণপন চেষ্টা করতেন সে সময় তা বাতিল করতে। না পারলে জন্মদিনে ঠিকই আমরা 'হ্যাপি বার্থ ডে' লেখা টেলিগ্রাম পেয়ে যেতাম। বাবার অপত্য স্নেহ আমরা চার ভাইবোন একইভাবে উপলব্ধি করি। সেজন্য প্রত্যেকেই মনে করি, বাবা বুঝি আমাকেই বেশি ভালোবাসে।

বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের অঙ্কুর বাবা আমাদের মনে এমনভাবে প্রোথিত করে দিয়েছেন এখনও তা সযত্নে লালন করে যাওয়ার চেষ্টা করছি। বাড়িতে তখন উর্দু গান বা সিনেমা দেখা নিষিদ্ধ। কোনো আত্মীয় আমাদের উর্দু সিনেমা দেখতে নিয়ে যেতে চাইলে তাকে বাড়িছাড়া করতেন। রবীন্দ্রনাথকে ভালোবাসতে শিখিয়েছেন বাবা, তাই আজও যেমন বাবা নিজে, তেমনি আমিও বাবার মতো কোনো বিষাদ বা হতাশ মুহুর্তে গীতাঞ্জলী নিয়ে বসি। ছোটবেলায় প্রতিবছর ২১ ফেব্রুয়ারি বাবার সঙ্গে শহীদ মিনারে যেতাম আমরা পিঠাপিঠি দুই বোন। প্রেস ক্লাবের মালীচাচা আগে থেকে আমাদের জন্য দুটি সুন্দর ফুলের তোড়া বানিয়ে রাখতেন। সে সময় শহীদ মিনারে গুটিকয়েক মানুষ যেত।

পাকিস্তানিরা আমাদের ঠকাচ্ছে – এ কথাটি নিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে রীতিমতো ঝগড়া করতাম। এত ছোট মেয়ে এসব কথা শিখল কীভাবে, তা নিয়ে বিস্ময় প্রকাশ করত কেউ কেউ। কিন্তু বাবার রাজনৈতিক আদর্শ তখন আমাদের ছোট্ট মনেও এ ধারণাটি গেঁথে দিয়েছিল যে, বাংলাদেশ একদিন স্বাধীন হবেই। একাত্তরের মার্চে বঙ্গবন্ধু, ইয়াহিয়া আর ভুট্টোর আলোচনা, অসহযোগ আন্দোলন, বঙ্গবন্ধুর ভাষণ

ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আমাদের বাড়ি ছিল উত্তাল, সে আলোচনায় স্কুলপড়ুয়া আমরা দুই বোনও অংশ নিতে পারতাম বাবার আগ্রহে।

বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতার একটি উদাহরণ দিতে পারি। স্বাধীনতার পরপর বঙ্গবন্ধু তখন প্রধানমন্ত্রী। বাড়ির সামনে বন্ধুদের সঙ্গে গল্প করছি, হঠাৎ বাবা গাড়ি নিয়ে এলেন, বললেন উঠ, সোজা নিয়ে গেলেন বঙ্গবন্ধুর ৩২ নম্বর বাড়িতে। হন হন করে উঠে গেলেন দোতালায় বঙ্গবন্ধুর শোবার রুমে। একটি ছবি বের করে আমাকে দেখিয়ে বললেন ওর নাম ঝুমা, এখানে আপনার অটোগ্রাফ দিয়ে দিন। বঙ্গবন্ধু বিনাবাক্যে আমাকে অটোগ্রাফ দিলেন। এখন ভাবতে অবাক লাগে কীভাবে একজন প্রধানমন্ত্রী এতটা সরল জীবনযাপন করতেন।

মানুষের উপকার করা যেন বাবার ব্রত। শুধু গ্রামের বাড়ী নয়, বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে কারোর চাকরি, কারোর বদলি, এলাকার স্কুল প্রতিষ্ঠা, মসজিদ সংস্কার, রাস্তা মেরামত নানা অনুরোধ নিয়ে মানুষের আগমন চলছেই। এমনকি হাসপাতালে অসুস্থ অবস্থায় থেকেও তার রেহাই নেই। রেহাই পাবে কীভাবে – এতে যে বাবার অপরিমেয় আনন্দ।

সহকর্মীদের কাজ শিখিয়েছেন পিতৃস্নেহে। আজ তার গল্প করে অনেকে। প্রেস ক্লাবে সেদিন এক প্রবীণ সাংবাদিক একটি গল্প করছিলেন। একটি ইংরেজি সাপ্তাহিকের বাবা তখন উপদেষ্টা সম্পাদক, কিন্তু বার্তা সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করতেন। ভদ্রলোক তখন সেখানকার জুনিয়র রিপোর্টার। একদিন তার রিপোর্ট বাবার পছন্দ হয়নি বলে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। মন খারাপ করে তিনি চলে গেলেন। রাত দুটোর সময় হঠাৎ শোনে বাড়ীর সামনে গাড়ীর হর্ন। দরজা খুলে দেখলেন তার বাসায় মূসা ভাই। 'হাতে পরের দিনের কাগজ, যার লিড ছিল ছুড়ে ফেলা আমার রিপোর্টটি'। একজন জুনিয়র রিপোর্টারের ছুঁড়ে ফেলা রিপোর্টটি নিজে কুড়িয়ে নিয়ে রিরাইট করে ছাপিয়ে বাড়িতে যাওয়ার সময় তাকে আবার তা দেখিয়ে নিয়ে যাওয়ার চিন্তা একমাত্র এবিএম মূসাই করতে পারেন। বাবার পেশা ধারন করেছি ঠিকই, কিন্তু অর্জনের বিচারে তার ধারেকাছেও যেতে পারিনি। এর কারণ শুধু সুযোগের অভাব নয়, মেধারও ঘাটতি।

বাবার এত প্রশংসা – নিন্দা করার কি কিছুই নেই? আছে। বাবা মানুষকে বিশ্বাস করেন সহজে। যাকে বিশ্বাস করেন তাকে অন্ধভাবে করেন। তাতে ঠকলেও তার আপত্তি নেই। তিনি সবসময় বলেন, মানুষকে বিশ্বাস করে ঠকলেও লাভ। সেজন্য বলি, আমার বাবার অনেক শত্রু আছে, কিন্তু বাবা কারোর শত্রু নয়।

পুস্তক পুনর্বীক্ষণ

এবিএম মূসা'র 'মুজিব ভাই'

রোবায়েত ফেরদৌস

বইটি দারুণ, বইয়ের ভূমিকা আরও দারুণ। বইটি লিখেছেন এবিএম মূসা আর ভূমিকা লিখেছেন তাঁর বন্ধু আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী। *মুজিব ভাই* – বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে নিয়ে বর্ষীয়ান সাংবাদিক এবিএম মূসার অনন্য সাধারণ এক বই। প্রায় দু'দশক ধরে বিভিন্ন দৈনিক ও সাময়িকীতে প্রকাশিত এগারটি প্রবন্ধের সংকলন এটি। একশ পৃষ্ঠার ছোট্ট-গভীর-মিষ্টি এক বই!

বইটি সম্পর্কে গাফ্ফার চৌধুরীর যথার্থ মন্তব্য: '*মুজিব ভাই* বইটি আমি এক নিঃশ্বাসে পড়েছি। মনে হয়েছে, বইটি পড়ার সময় লেখক বন্ধুবর মূসার চেয়েও বঙ্গবন্ধুর সান্নিধ্য পেয়েছি বেশি। তরুণ প্রজন্মের যেসব পাঠক বঙ্গবন্ধুকে ব্যক্তিগতভাবে দেখার সুযোগ পাননি, তাঁরাও বইটি পাঠের সময় বঙ্গবন্ধুর সান্নিধ্য অনুভব করবেন। ছোট চৌবাচ্চার পানিতে যেমন সূর্যের মতো বিরাট গ্রহের প্রতিবিম্ব ধরে রাখা যায়, তেমনি এবিএম মূসার মুজিব ভাই নামের ছোট বইটিতে এক মহানায়কের বিশাল চরিত্রকেও তুলে ধরা সম্ভব হয়েছে।'

বইয়ের ফ্ল্যাপ মূলত বইয়ের বিজ্ঞাপন, কাটতি বাড়াতে বাড়তি কথার ঠাটবুনোন; কিন্তু বলতে দ্বিধা নেই, *মুজিব ভাই* বইটি যেন এর সরাসরি ব্যতিক্রম; ফ্ল্যাপের লেখা সত্যিকার অর্থেই বইটির প্রাণভোমরাকে এক টানে আঁকতে সক্ষম হয়েছে: একেবারে ঘরোয়া আটপৌরে ভাষায় জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনের নানা দিক এই বইয়ে এমনভাবে তুলে ধরা হয়েছে, এক কথায় যাকে বলা যায়, অতুলনীয়। একজন মানুষ যখন সাধারণ থেকে অসাধারণ বা সবিশেষ হয়ে ওঠেন, হয়ে ওঠেন ইতিহাসের মহত্তম ব্যক্তিত্ব, তখন তাঁর ঘরোয়া জীবন আড়ালে ঢাকা পড়ে যায়। লেখক এবিএম মূসা তাঁর টগবগে যুবা বয়স থেকে শেখ মুজিবকে দেখেছেন। কালক্রমে তিনি 'মুজিব ভাই'য়ের নিবিড় সান্নিধ্যে এসেছেন। ফলে তাঁর পক্ষে বঙ্গবন্ধুর ঘরোয়া জীবনের এমন সব দিক এই বইয়ে তুলে ধরা সম্ভব হয়েছে, যা এত দিন আমাদের জানার বাইরে ছিল। আর শুধু বঙ্গবন্ধু কেন, তাঁর জীবনের সর্বাত্মক প্রেরণাদাত্রী সহধর্মিণী ফজিলাতুন্নেসা এবং তাঁর তিন পুত্রের কথাও মূসা তাঁর অনন্য সাধারণ মুন্সীয়ানায় এমনভাবে তুলে ধরেছেন, পাঠককে যা মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখবে।

বিশেষ কীভাবে হয়ে ওঠে নির্বিশেষ? 'ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা' কেমন করে 'সবার অভিজ্ঞতা' হয়ে ওঠে? – এ বই তার বড় প্রমাণ। ব্যক্তিগত স্মৃতিচারণমূলক বইকে মূসা তাঁর মুন্সীয়ানা আর তীক্ষ্ণ লেখক সত্তা দিয়ে এমনভাবে 'ফাইন টিউনড্' করেছেন তা নিছক বঙ্গবন্ধুর ঘরোয়া জীবনের কথায় আটকে থাকেনি, হয়ে উঠেছে একটি নির্দিষ্ট কালপরিসরে বাঙালি জাতির রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনের অমূল্য দলিল।

একটি লেখার শিরোনাম 'রঙ্গরসে বঙ্গবন্ধু' – এখানে বঙ্গবন্ধুর 'সেন্স অব হিউমার'র অসাধারণ কিছু নমুনা তুলে ধরেছেন লেখক; সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশে বিদেশী কোম্পানি এসেছে গ্যাস অনুসন্ধানের জন্য। তাদের সঙ্গে আলোচনায় বসেছেন প্রধানমন্ত্রী, খনিজ সম্পদমন্ত্রী এবং আইনমন্ত্রী ড. কামাল হোসেন; বৈঠক শেষে বিকেলে গণভবনের বারান্দায় খোশগল্পের নিয়মিত আসরে বঙ্গবন্ধু মজা করছেন এই বলে যে, 'বিদেশী কোম্পানিদের বলেছি, শুধু গ্যাস নয়, আমার দেশে তেলও আছে। তেল পেতে

হলে একটি দেশের দুটি বৈশিষ্ট্য থাকতে হয়। এক. মুসলিম দেশ হতে হয় আর দুই. ইট মাস্ট বি হেডেড বাই শেখ – রাষ্ট্রপ্রধানকে শেখ হতে হয়। আমার দেশে দুটিই আছে!' এবিএম মূসা লিখেছেন, 'কথাগুলো বলে দিলখোলা বঙ্গবন্ধু হো-হো করে হেসে উঠলেন।'

ফজিলাতুন্নেছা মুজিবকে লেখক যেভাবে চিত্রিত করেছেন এক কথায় তা বিস্ময়কর! ফজিলাতুন্নেছা কখনো 'ফার্স্ট লেডি' হতে চাননি; কারণ, সুদূর গ্রাম থেকে যে গ্রাম্য কিশোরীর ছাপটি মুখে নিয়ে স্বামীর হাত ধরে শহরে এসেছিলেন, সেটি কোনো দিন তিনি মুছতে দেননি; ৩২ নম্বর বাড়ির দোতলায় বিছানায় পা ছড়িয়ে বসে জাঁতি দিয়ে সুপারি কাটছেন, মুখে পান, হাতের ওপরে চুন – এই ছিল মুজিব-গিন্নির ঘরোয়া রূপ। ইন্দিরা গান্ধী ঢাকায় এলে বঙ্গবন্ধু খোশামোদ করে জীবনে প্রথম বেগম মুজিবকে বাইরে, মানে ইন্দিরার সঙ্গে মঞ্চে নিয়ে এসেছিলেন। মূসা লিখেছেন, বেগম মুজিব এক হাতে কাতান শাড়ি সামলাচ্ছেন, অন্য হাতে পানের বাটা ধরে আছেন। বঙ্গবন্ধু মৃদুস্বরে ধমকে উঠলেন, 'ওটা আবার নিয়ে আসলা ক্যান?'

১৯৬৯ সাল। গণ-অভ্যুত্থানে বিধ্বস্ত আইয়ুব খান গোল টেবিল বৈঠক ডাকলেন। প্রস্তাব দিলেন শেখ সাহেবকে প্যারোলে মুক্তি দিয়ে বৈঠকে যোগ দেওয়ার। বঙ্গবন্ধুর মুক্তির দাবিতে তখন রোজ রাতে লাখো মানুষের ঢল নামছে আর তিনি কি-না মুচলেকা দিয়ে আইয়ুবের দরবারে যাবেন? এ নিয়ে দেশের মানুষ কিছুটা বিভ্রান্ত। মূসা লিখেছেন, মুচলেকা নাকি নিঃশর্ত মুক্তি–এই যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত দিয়েছিলেন একজন নারী। মুজিবের সহধর্মিণী, যিনি রাজনীতি বুঝতেন না, কিন্তু নিজের স্বামীকে বুঝতেন। বুঝতে পেরেছিলেন তাঁর স্বামীর মানসিক দ্বন্দ্ব। বন্দী স্বামীকে খবর পাঠালেন, 'হাতে বঁটি নিয়ে বসে আছি, প্যারোলে মুচলেকা দিয়ে আইয়ুবের দরবারে যেতে পারেন; কিন্তু জীবনে ৩২ নম্বরে আসবেন না।' কে আছেন পাঠক এটা পড়ে যার চোখে জল আসবে না? মূসা দাবি করেছেন, কস্তরবা যেমন গান্ধীর সঙ্গে চরকা কেটেছেন, জেলে গিয়েছেন, নেহেরুর কারাসঙ্গিনী যেমন কমলা, দেশবন্ধুর সহধর্মিণী যেমন বাসন্তী দেবী তেমনি ইতিহাসে ফজিলাতুন্নেছার নামও উচ্চারিত হওয়া উচিত। জীবন ও যৌবনের শ্রেষ্ঠ সময়টি যে নারীর জীবন থেকে বারবার ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে, স্বামীর জন্য তাঁর ত্যাগের কথা মানুষ হয়তো একসময় ঠিকই জানবে।

সাংবাদিকতার সঙ্গে রাজনীতি ও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের পেশাগত সম্পর্ক তৈরি হয় – এটা সবারই জানা; কিন্তু পেশাগত সম্পর্কের ছোট্ট বৃত্তের বাইরে বঙ্গদেশের সাংবাদিকতার তিন পথিকৃৎ – ফয়েজ আহমদ, এবিএম মূসা আর আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরীর সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল তার কিছু চমকপ্রদ কথকতা আছে বইটিতে; বঙ্গবন্ধু আদর করে এই তিন সাংবাদিকের নাম দিয়েছিলেন – আপদ, বিপদ, মুসিবত; ফয়েজ আহমদ 'আপদ', এবিএম মূসা 'বিপদ' আর আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরীকে বঙ্গবন্ধু ডাকতেন 'মুসিবত' বলে। এরকম মজার মজার তথ্য আছে বইটিতে; কিন্তু আর বেশি বলা যাবে না, তাতে বইটি কেউ আর কিনে পড়বেন না; কিন্তু আমি বইটির গ্রন্থালোচনা করছি এই উদ্দেশ্যে যেন সবাই বইটি পড়েন। এটি প্রকাশ করেছে *প্রথমা প্রকাশন*, প্রচ্ছদ ও অলংকরণ: কাইয়ুম চৌধুরী, মূল্য: ১৭০ টাকা, প্রথম প্রকাশ: আগস্ট ২০১২।

গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের সুবর্ণজয়ন্তী সেমিনারে এবিএম মূসা

প্রযুক্তির সুবাদে সাংবাদিকতা এখন অনেক বিস্তৃত

মো. রুম্মান শিকদার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে আয়োজিত সেমিনারে প্রথিতযশা সাংবাদিক ও কলাম লেখক এবিএম মূসা বাংলাদেশে সাংবাদিকতার সাম্প্রতিক প্রবণতার ওপর তাঁর মূল্যায়ন ও পর্যবেক্ষণ তুলে ধরেন। এ অংশে তাঁর বক্তব্যের অংশ-বিশেষ তুলে ধরা হলো:

সেমিনারে এবিএম মূসা বলেন, আমাদের দেশে আরব বসন্তের মতো কিছু ঘটেনি গণমাধ্যমের জন্য। মানুষ তাদের ক্ষোভগুলো গণমাধ্যমে প্রকাশ করতে পারছে। এখানে গণমাধ্যমকে বন্ধ করে দেওয়া হলে মানুষ ক্ষোভ প্রকাশ করতো প্রেসক্লাবের সামনে অথবা গুলিস্তানের মোড়ে। বিরোধী দল সংসদে জনগণের পক্ষে কথা না বললেও মধ্যরাতের টকশোগুলোতে সাধারণ মানুষের পক্ষে কথা বলতে শোনা যায়।

তিনি বলেন, আমরা যখন সাংবাদিকতা শুরু করেছিলাম তখন এটা ছিল মিশন; পরে এটা হয়ে যায় প্রফেশন; আর এখনকার সাংবাদিকতা ব্যবসার ক্ষেত্র। সংবাদ এখন সের দরে বিক্রি হচ্ছে। অনেকেই রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে বা ব্যবসায়ের স্বার্থ উদ্ধারের জন্য গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠা করছে। তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়ার মতো সাংবাদিকতার দায়িত্ববোধ থেকে খুব কম মানুষই মিডিয়া প্রতিষ্ঠা করছে।

সংবাদ এখন সাহিত্যে পরিণত হয়েছে। কোনো কোনো সংবাদের শেষ লাইন পর্যন্তও পড়ে বোঝা যায় না আসলে কী ঘটেছে। তিনি একটি খেলার সংবাদের কথা উল্লেখ করে বলেন, কিছু দিন আগে অস্ট্রেলিয়া ও পাকিস্তানের ক্রিকেট খেলার একটি খবরের পাঁচ কলাম পুরোটা পড়েও বুঝতে পারিনি খেলার ফলাফলটা আসলে কি। বর্তমান প্রজন্মের সাংবাদিকদেরকে তিনি এ প্রবণতা থেকে বেরিয়ে আসার পরামর্শ দেন।

এবিএম মূসা বলেন, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ প্রতিষ্ঠার প্রথম দিকে সাংবাদিকতা শিক্ষার প্রতি আমার বিতৃষ্ণা ভাব ছিল। কারণ, এখানে তাত্ত্বিক বিষয়টাই বেশি ছিল। যখন সংবাদপত্রের সম্পাদক ছিলাম এ বিভাগের কোনো শিক্ষার্থী আমার কাছে চাকরির জন্য গেলে আমি বলতাম ওখান থেকে যা শিখে এসেছ আগে তা ভুলে আস। আমার ধারণা ছিল, সাংবাদিকতা প্রাতিষ্ঠানিক পড়াশোনার বিষয় না, এটা হাতে-কলমে শিখতে হবে-যেমনি ডাক্তার হতে হলে হাসপাতালে হাতে কলমে চর্চা নিতে হয়।

তবে পরবর্তীকালে তিনি এ বিভাগের শিক্ষাকে এতটাই পছন্দ করতে শুরু করেন যে তাঁর নিজ কন্যাকেও এ বিভাগে ভর্তি করিয়ে দেন । চাকরির ক্ষেত্রে এ বিভাগের শিক্ষার্থীদের ওপর তার সে শর্তও তিনি পরবর্তীকালে উঠিয়ে নেন। তিনি এমসিজে বিভাগকে উন্নয়নমূলক সাংবাদিকতার ওপর জোর দিতে বলেন। পাশাপাশি, দেশে কি কি ভাল কাজ হচ্ছে তা বর্তমান প্রজন্মের সাংবাদিকদেরকে সত্যনিষ্ঠভাবে তুলে ধরারও পরামর্শ দেন। এছাড়াও তিনি অনুসন্ধানমূলক সাংবাদিকতার ওপর জোর দিতে এ বিভাগকে পরামর্শ দেন। কারণ, অনুসন্ধানমূলক সাংবাদিকতার মাধ্যমেই দেশের মানুষের মনের কথা উঠে আসে। দেশে প্রকৃতঅর্থে কী ঘটছে তা অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার চর্চার মধ্য দিয়েই তুলে ধরতে হবে।

তিনি বলেন, সাংবাদিকতা শিক্ষা এখন অনেক বিস্তৃত হচ্ছে। প্রযুক্তির সুবাদে সাংবাদিকতা এখন অনেকদূর এগিয়ে গেছে। সম্প্রচার মাধ্যম এখন দিন দিন অনেক জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। অনলাইন মাধ্যম আসার পরে মুদ্রণ মাধ্যম এখন বিশ্বব্যাপী বিলুপ্তির পথে। কিন্তু আমাদের দেশের সবার হাতে কম্পিউটার প্রযুক্তি না পৌছানোর জন্য অনলাইন মাধ্যমের ব্যাপক বিস্তার সম্ভব নয়; তবে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে এর বিস্তার ঘটানো যেতে পারে।

সেমিনারের আলোচনায় এবিএম মূসা তাঁর সাংবাদিকতা জীবনে এগিয়ে যাবার গল্প শোনান নতুন প্রজন্মের শিক্ষার্থীদের উদ্দ্যেশ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান আতিকুজ্জামান খান সম্পর্কেও অনেক কথা বললেন তিনি। আতিকুজ্জামান বিদেশ থেকে সংবাদপত্র ব্যবস্থাপনার ওপর ডিগ্রি নিয়ে এসে প্রথমে শাখারী বাজার থেকে পাকিস্তান পোস্ট নামে একটি ইংরেজি দৈনিক প্রকাশ করেছিলেন। সাংবাদিকতা ছাড়াও তিনি ছিলেন পূর্ব পাকিস্তান ক্রিকেট দলের অধিনায়ক। একইসঙ্গে তিনি ছিলেন বাংলাদেশ ক্রীড়া লেখক সমিতির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি।

আলোকচিত্রে দেশবরেণ্য সাংবাদিক এবিএম মূসা'র কিছু একান্ত মূহূর্ত